অবশেষে থ্রিজির যুগে প্রবেশ

মোস্তাফা জব্বার

অবশেষে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক তথা থ্রিজির নিলাম হলো ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩। এদিন গ্রামীনফোন ১০ মেগাহার্টজ ও অন্য তিন অপারেটর রবি, বাংলালিংক ও এয়ারটেল ৫ মেগাহার্টজ করে স্পেকট্রাম বরাদ্দ পায়। মোবাইল অপারেটর সিটিসেল এ নিলামের বাইরে রয়ে গেছে। এরা টাকার অভাবে নিলামে অংশ নিতে পারেনি। বিদেশী একটি অপারেটরের অংশ নেয়ার সুযোগ থাকলেও নিলামে কোনো বিদেশী অপারেটর অংশ নেয়নি। নিলামে মোট ৪০ মেগাহার্টজের মাঝে ১৫ মেগাহার্টজ অবিক্রীত থেকে যায়। থ্রিজির নিলামে বারবার দেরি হওয়ার ফলে বিদেশীদের আকর্ষণ কমে গেছে এবং এত বিপুল পরিমাণ স্পেকট্রাম অবিক্রীত রয়ে গেছে। এ নিলামে প্রতি মেগাহার্টজ ১৬৩ কোটি টাকা হিসেবে তরঙ্গ বরাদ্দ বাবদ সরকারের মোট রাজস্ব আয় ৪ হাজার ৮১ কোটি টাকা। এর সাথে টেলিটকের ১৬৩০ কোটি টাকা যুক্ত হবে। নিলামের জন্য নির্দিষ্ট করা সব স্পেকট্রাম নিলাম হলে সরকারের আরও সোয়া ২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আসত। বস্তুত অদক্ষতার জন্য জাতির এ অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে অনেকে মনে করেন।

৩০ দিনের মাঝে অপারেটরদেরকে এ অঙ্কের শতকরা ৬০ ভাগ পরিশোধ করতে হবে। বাকিটা ১৮০ দিনের মধ্যে শোধ করতে হবে। এ হিসাবে বর্তমান সরকারের আমলে ৪ হাজার ৮১ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৮৮ কোটি টাকার রাজস্ব সরকারি খাতে জমা হবে। বাকিটা পরের সরকারের আমলে জমা হবে। নিলামের শর্তানুসারে ৯ মাসের মধ্যে বিভাগীয় শহরগুলোতে থ্রিজি নেটওয়ার্ক প্রাপ্য হওয়ার কথা। কেউ এমনটি করতে ব্যর্থ হলে তাকে ৫০ কোটি টাকা জরিমানা করা হবে।

নিলাম অনুষ্ঠানে বিটিআরসি চেয়ারম্যান দাবি করেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও শ্রীলঙ্কার পরই বাংলাদেশ থ্রিজির যুগে পা ফেলেছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। তিনি ভুল তথ্য দিয়েছেন। আমার নিজের ধারণা– আমরা দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান ছাড়া সবার শেষে থ্রিজি মোবাইল নেটওয়ার্কের লাইসেন্স ইস্যু করলাম। পাওয়া তথ্যানুসারে ২০০৬ সালে শ্রীলঙ্কা, ২০০৭ সালে নেপাল, ২০০৮ সালে ভারত ও মালদ্বীপ, ২০১২ সালে আফগানিস্তান এবং ২০১৩ সালে ভুটান থ্রিজির যুগে পা রেখেছে। পাকিস্তান থ্রিজি/ফোরজি নিলামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান ২০০৮ সাল থেকে বারবার থ্রিজির নিলামের কাজটি পিছিয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের থ্রিজি নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম কাকতালীয়ভাবে একই ধরনের।

পাওয়া তথ্যানুসারে গাড়িতে থ্রিজিতে চলন্ত অবস্থায় ৩৮৪ কেবিপিএস, হাঁটা অবস্থায় ২ এমবিপিএস ও স্থিরভাবে ৪ এমবিপিএস ডাটা পারাপার করা যায়। আমাদের মতো দেশে এ গতির ডাটা মোটামুটিভাবে কাজ সারার উপযোগী বলে মনে করা হয়।

এ নিলামের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালে থ্রিজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং ২০১২ সালের ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেলিটকের পরীক্ষামূলক থ্রিজি নেটওয়ার্কের উদ্বোধন করেন। সেই সুবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এখন থ্রিজি নেটওয়ার্ক আছে। তরঙ্গ নিলামের পর সাংবাদিক সম্মেলনে করে গ্রামীণফোন জানায়, তারা অক্টোবরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে থ্রিজি সেবা দেবে। একই ঘোষণা রবিও দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে লাইসেন্স সহকারে থ্রিজি চালু করার সরকারি উদ্যোগটি যথাযথ দক্ষতায় সঠিক সময়ে সামনে আসেনি। ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় আসে সেই সরকারের প্রায় চার বছর সময় শুধু পরীক্ষামূলকভাবে থ্রিজি চালু করতে লেগে যাওয়ার কথা ছিল না। এ কাজটি করতে গিয়ে আমাদের টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয় অহেতুক গড়িমসি করেছে এবং প্রযুক্তিবান্ধব প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের সদিচ্ছাকে শ্লথ করে দিয়েছে। থ্রিজি লাইসেন্সিং গাইডলাইন যদি এ সরকার ২০০৯ বা ২০১০ সালে দিতে পারত, তবে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে দক্ষ বলা যেত। শুধু গাইডলাইন প্রস্তুত করতে ২০১২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় নেয়াটা কোনোভাবেই প্রশংসা করার মতো কাজ নয়। তারা তখনই ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাত পারত। অন্যদিকে ২০১২ সালের মার্চ মাসে গাইডলাইন হাতে পাওয়ার পর টেলিকম মন্ত্রণালয়ের শুধু একটি সভা করতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময় নেয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকি এরপরও পুরো এক বছর নিলামের জন্য অপচয় করাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

যাই হোক, বাংলাদেশ সরকারের টেলিযোগাযোগ বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী রাজিউদ্দিন রাজু ২০১২ সালের মধ্যেই থ্রিজির লাইসেন্স দেয়ার কাজ সম্পন্ন করার অঙ্গীকার করেছিলেন। গত ২৪ জুন ২০১২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তিনি এ অঙ্গীকার করেন। ২৪ জুন রাতে প্রচারিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবরে বলা হয়, সংসদে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পর্বের জবাবে রাজিউদ্দিন রাজু জানান, এখন তার মন্ত্রণালয় বিটিআরসি প্রদত্ত গাইডলাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। খুব শিগগিরই এ গাইডলাইনটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হবে এবং এরপর সেই গাইডলাইনটি বিটিআরসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এ গাইডলাইনটি অনুসরণ করে ২০১২ সালের মধ্যেই থ্রিজি প্রযুক্তির লাইসেন্স দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি জাতীয় সংসদের স্পিকারের সামনে সদস্যদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন। যদিও তার সেই প্রতিশ্রুতি সরকারের আরেকটি প্রতিষ্ঠান বিটিআরসির সময়সীমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, তবুও সেটি ছিল মোটামুটি একটি আশার আলো। তার সময়সীমা বহাল থাকলে বর্তমান সরকারের মেয়াদেই থ্রিজির রাজস্ব যেমন পেত, তেমনি দেশের বিশাল অংশে থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু হয়ে যেত।

এর আগে বিটিআরসি থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার গাইডলাইন প্রস্তুত করে সেটি অনুমোদনের জন্য টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেই পরিকল্পনা মতে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে পাঁচটি মোবাইল অপারেটরকে থ্রিজি, ফোরজি এবং এলটিই লাইসেন্স দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয় যথাসময়ে উদ্যোগ না ▸

নেয়ার ফলে নভেম্বরের নিলামটি অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য আমরা একটু পেছনের দিকে তাকালে টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ের অবহেলার চিত্রটি আরও একটু ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হব।

৩ এপ্রিল ২০১২ দৈনিক সংবাদের খবরে বলা হয়, থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার জন্য প্রথমে লাইসেন্সের নিলাম হবে এবং নিলামের পর লাইসেন্স ইস্যু করা হবে। লাইসেন্স দেয়ার শর্ত হিসেবে লাইসেন্স ইস্যুর ৬/১২ মাসের মধ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরে, ১৬/২৪ মাসের মধ্যে ৩০টি জেলায় এবং ৩৬ মাসের মধ্যে সারাদেশে এ সেবা চালু করতে হবে। এর অর্থ, ২০১২ সালের ডিসেম্বরেও যদি লাইসেন্স দেয়া হতো তবে ২০১৩ সালের জুনের মধ্যেই আমরা সব বিভাগীয় শহরে থ্রিজির যুগে পা রাখতে পারতাম। ২০১৫ সালের মধ্যে সারাদেশ এ যুগে পা রাখতে পারত। পুরো প্রক্রিয়াটি পিছিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান হিসেবে ২০১৪ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভাগীয় শহরে, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৩০টি জেলা সদরে এবং ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সারাদেশে থ্রিজি নেটওয়ার্ক পাওয়ার কথা।

উল্লেখ্য, থ্রিজি প্রযুক্তি চলতি শতকের শুরুতে চালু হয়। ১৯৯৮ সালে জাপানের এনটিটি ডকুমো এর পরীক্ষামূলক প্রচলন করে এবং ২০০১ সালের অক্টোবরে এর বাণিজ্যিক প্রচলন হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে এটি ইউরোপে এবং পরের বছরের জুলাইয়ে এটি আমেরিকায় চালু হয়। এটি দ্রুতগতির একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এর ফলে মোবাইল ফোনে কথা বলার পাশাপাশি তথ্য, ছবি ও শব্দ পারাপার দ্রুতগতির হয়। এর প্রভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ধারা গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট পিসি, নেটবুক ও কমপিউটারের সহায়তায় মানুষে মানুষে যোগাযোগ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগে পৌঁছে।

থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার অগ্রগতির বিষয়ে দৈনিক সংবাদের খবরটির মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যায় : ক. এ ধরনের লাইসেন্স দেয়ার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে বিটিআরসি গত ২৮ মার্চ ২০১২ টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় । খ. খসড়া অনুসারে ৭ মে ২০১২ থেকে নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। আবেদনের সময় ১২ জুলাই ২০১২ পর্যন্ত থাকার কথা ছিল। ১৯ জুলাই যোগ্য আবেদনকারীর নাম ঘোষণা করার কথা ছিল। ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ নিলাম হওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইতোমধ্যেই টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয় এসব তারিখ পার করে দিয়েছে এবং এসব কাজের কোনোটিই সম্পন্ন করা হয়নি। ২৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখে এসেও বিটিআরসির ওয়েবসাইটে এ ধরনের কোনো গাইডলাইন দেখা যায়নি। এটি ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে গড়ায়।

বিটিআরসির প্রাথমিক ও প্রস্তাবিত গাইডলাইন অনুসারে লাইসেন্সের আবেদন ফি ৫ লাখ টাকা এবং লাইসেন্স ফি ১০ কোটি টাকা ছিল। লাইসেন্সের প্রস্তাবিত নবায়ন ফি হওয়ার কথা বার্ষিক ৫ কোটি টাকা ছিল। রেভিনিউ শেয়ারিং ৫.৫ শতাংশ এবং সামাজিক দায় ফি শতকরা ১ শতাংশ থাকার কথা ছিল। মোট পাঁচটি লাইসেন্স দেয়ার প্রস্তাব ছিল। ১৫ বছরের জন্য লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। লাইসেন্স দেয়ার শর্ত হিসেবে এ প্রযুক্তি প্রসারের একটি সময়সীমা রয়েছে, যার সর্বোচ্চ মেয়াদ তিন বছর।

সংসদে টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রীর সময় ঘোষণার পর টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি সভা করে। সর্বশেষ তথ্যে বলা হয়েছিল, ২০১৩ সালের শুরুতে এ গাইডলাইন অনুসারে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে এবং জুন মাস নাগাদ অন্য অপারেটরেরা থ্রিজি সেবা দিতে সক্ষম হবে। ওপরে বর্ণিত তারিখ এবং হিসাবগুলো সবই আবার ওলটপালট হয়ে যায়। মন্ত্রণালয় এসব দিনক্ষণ তারিখ কোনোটাই ঠিক রাখতে পারেনি।

থ্রিজি নিয়ে টেলিকম মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি যা করেছে, তা নিয়ে আমরা জাতিগতভাবে যথেষ্ট ভুগেছি। এ সরকারের যত দক্ষতা আছে এ মন্ত্রণালয় যেনো তার সাথে কোনোভাবেই তাল মেলাতে চায়নি। বিদ্যমান মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স নবায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, ফি নির্ধারণ, ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো, ইন্টারনেটের দাম নিয়ন্ত্রণ না করা, সাইবার ক্রাইমের বিষয়ে নীরবতা পালন– এসব নিয়ে পানি কম ঘোলা করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত কাজগুলো হলেও যত স্বাভাবিকভাবে এসব হওয়ার কথা তা মোটেই হয়নি। দেশে মোবাইলের প্রবৃদ্ধি আকর্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেলেও ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটির যে চরম দৈন্যদশা তার কোনো উন্নতি এখন পর্যন্ত হয়নি। দেশে দুটি ওয়াইম্যাক্স অপারেটর কাজ করলেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও ভালোভাবে কাজ করার মতো ব্রডব্যান্ড সংযোগ এখনও বিরল। ঢাকা বা বিভাগীয় শহরে ওয়াইম্যাক্স সংযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো জেলাতেও ওয়াইম্যাক্স সংযোগ দেয়া হয়। কিন্তু কোন প্যাকেজে কী স্পিড লেখা থাকবে এবং বাস্তবে সেটিতে কী পাওয়া যাবে তার কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। বরং এমন অনেক সময় থাকে যখন সাধারণ টুজি কানেকশনে যে ধরনের স্পিড থাকা উচিত তাও ব্রডব্যান্ড কানেকশনে পাওয়া যায় না। মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে সিডিএমএ প্রযুক্তিনির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান থ্রিজি পর্যায়ের এক ধরনের ব্রডব্যান্ড সংযোগ দিয়ে থাকে, যাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রডব্যান্ড সংযোগ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। আমার ধারণা ছিল, এর প্রসার অনেক বেশি হলে ব্রডব্যান্ডের প্রসারও বেশি হবে। এ প্রতিষ্ঠানটির সাবেক প্রধান নির্বাহী আমাকে জানিয়েছিলেন, তাদের সেই প্রযুক্তির জন্য নতুন কোনো প্রযুক্তি তাদেরকে ব্যবহার করতে হয় না। বিদ্যমান বিটিএসগুলোকে মডিফাই করেই তারা দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ দিতে পারছেন। এজন্য বিটিআরসি কোনো নতুন লাইসেন্সও দেয়নি। নতুন কোনো স্পেকট্রাম বরাদ্দ নেয়ার দরকারও হয়নি। এ কানেকশন পরীক্ষা করে আমি দেখেছি, ইচ্ছা করলে সত্যি সত্যি বেশ দ্রুতগতির ব্যান্ডউইডথ দেয়া সম্ভব। এরা একেবারে নিখাদ থ্রিজি প্রযুক্তি দিতে পারে। ডব্লিউসিডিএমএ নামে এ প্রযুক্তি সময়ের অনেক এগিয়ে থাকা প্রযুক্তি ছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকৃতপক্ষে থ্রিজির সব সুযোগ সুবিধাই দেয়া যেতে পারে। দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন কলের জন্য এটি একটি উন্নততর ব্যবস্থা বলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু এ মোবাইল অপারেটরটি অতিরিক্ত ব্যবসার লোভে যে গতির কথা বলে সেই গতি ব্যবহারকারীকে দেয় না। আমি এর প্রধান ব্যক্তির সুপারিশে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে বোকা বনে গেছি। এখন আমার অফিসে বা বাসায় কোনো কোনো সময় আমি আমার নিজের মেইল সাইট ওপেন করতে পারি না। বারবার অভিযোগ করার পরও তাদের চেতনার উদয় হয়নি। একইভাবে যারা টুজি মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে সংযোগ নিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, তারা যে প্রতি মুহূর্তে হয়রানির শিকার হচ্ছেন সে ব্যাপারেও কারও কাছে কিছু বলার আছে কি না কেউ জানে না। বস্তুত ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে মোবাইল অপারেটরেরা তাদের ইচ্ছেমাফিক প্যাকেজ, প্রাইসিং ও স্পিড দিচ্ছে এবং যা খুশি তাই সেবা দিচ্ছে। এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করার জায়গা আছে বলেও মনে হয় না। নিয়মমাফিক বিটিআরসির এসব তদারকি করার কথা। কিন্তু বিটিআরসি কী আদৌ একজন সাধারণ ব্যবহারকারীর অভিযোগ তদন্ত করার ▸

সময় পাবে– এ ভয়ে আমি ও আমরা এদের অত্যাচার হজম করে যাচ্ছি। থ্রিজি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এ হতাশাও একটি বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু টুজি-থ্রিজি বা ফোরজি– নামে যাই হোক না কেনো, অতি মুনাফাখোর অপারেটরেরা যদি ব্যবহারকারীর কথা মনে না রেখে শুধু অর্থের দিকে ঝুঁকে থাকে তবে তার সুফল জাতি কখনও পাবে না।

এ সরকার যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়, তখন আমরা থ্রিজি ২০০৯ সালে পাব বলে আশায় বুক বেঁধেছিলাম। সেই সম্ভাবনাও ছিল। এর আগে ২০০৭-০৮ সালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তেমন প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু সেটি ২০১০ বা ২০১১ সালেও পাইনি। সর্বশেষ ২০১২ সালের স্বাধীনতা দিবসে বিটিসিএলের থ্রিজির উদ্বোধন হবে বলে ঘোষণা পেয়েছিলাম। অবশেষে ২০১২ সালের স্বাধীনতা দিবসের পর সাত মাস লাগল থ্রিজির যুগে প্রবেশ করতে।

সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিআরসির পক্ষ থেকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত হয়েছিল। সংস্থার চেয়ারম্যান নিজে অতিদ্রুত থ্রিজির লাইসেন্স দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অজুহাতে তখন লাইসেন্স দেয়ার কার্যক্রমটি শুরু করা হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই এটি সবার আগে সম্পন্ন করবে। কিন্তু চার বছরের বেশি সময় এ বিষয়টিতে আমরা শুধু হতাশাই দেখে এলাম। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর একটি নীতিমালা বা গাইডলাইন তৈরি করে তার ভিত্তিতে লাইসেন্স দেয়াই বিটিআরসির কাজ ছিল। দুনিয়ার বহু দেশ এমন নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছে। দক্ষিণ এশিয়াতেও এটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও ভারত অনেক আগেই লাইসেন্স দিয়ে থ্রিজি চালু করে দিয়েছে। এরা অতিদ্রুত থ্রিজির যুগে পা দিয়ে দেশকে ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সামনে নিয়ে গেছে। এক সময় আমরা মোবাইল প্রযুক্তিতে এসব দেশের চেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে কোনোভাবেই পেছনে ছিলাম না। বরং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি বেশি ছিল। কিন্তু থ্রিজির প্রশ্নেই আমরা প্রথম এসব দেশ থেকে পেছনে পড়ে গেলাম। আমি কোনো কারণ খুঁজে পাই না কেনো ছয় বছরেও আমাদের বিটিআরসি পাশের কোনো দেশ থেকে থ্রিজির গাইডলাইনের কপি এনে আমাদের মতো করে সেটি তৈরি করে দিতে পারল না? কেনো বিটিআরসি ধীরে চলো নীতি অনুসরণ করল? ওরা কী কেউ হিসেবে করে দেখেছে বিটিআরসির অঙ্কেই আমাদের জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ কত?

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। এরা ২০১৩ সালে যে কাজটি করছে সেটি যদি ২০০৯ সালে করত তবে পাঁচটি অপারেটর থেকে ৫০ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি এবং অন্তত ৫ কোটি টাকা করে বছরে ২৫ কোটি হিসেবে চার বছরে আরও ১০০ কোটি টাকার বাড়তি লাইসেন্স নবায়ন ফি পেত। এ খাতে সহজ হিসাবে ১৫০ কোটি টাকার রাজস্ব আসত। একই সাথে সরকার রেভিনিউ শেয়ারিং পেত চার বছরের। এ অঙ্কের পরিমাণটা আমি জানি না। তবে এতে হাজার কোটি টাকারও বেশি হতে পারত। এছাড়া দেশের জনগণ শতকরা ১ ভাগ সামাজিক দায়বদ্ধতার টাকায় প্রযুক্তির উৎকর্ষতা দেখতে পেত। অন্যদিকে অন্তত ৪ হাজার ৮১ কোটি টাকার রাজস্ব পেত জাতি। চার বছর এ রাজস্ব জাতিকে অনেক বেশি কিছু দিতে পারত। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এটি তাদের কাছে জানতে চাওয়া যায়, থ্রিজি লাইসেন্স দিতে বিলম্ব করার ফলে জাতির প্রযুক্তিগত ক্ষতির পাশাপাশি যে আর্থিক ক্ষতি হলো তার দায় কার? ১৫ মেগাহার্টজ অবিক্রীত থাকার দায় থেকেও তাদেরকে মুক্তি দেয়া যায় না।

আমরা জানি, এসব বিষয়ে জবাবদিহিতা বলতে কিছু আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোতে নেই। ১৯৯৪ সালে সাবমেরিন সংযোগ না পাওয়ার ফলে যে ক্ষতি হলো সে প্রশ্ন আমরা কাউকে করতে পারি না। চার বছরের ব্যর্থতার জন্য দায়ী রাজিউদ্দিন রাজু তার মন্ত্রণালয় থেকে দূরে সরে গেছেন। বিটিআরসির চেয়ারম্যান জিয়া আহমেদ আজ দুনিয়াতেই নেই। দুই জায়গায় আসা নতুন দুইজন অবলীলায় বলতে পারবেন– এ দায় তো আমাদের নয়। বরং জাতিকেই বলতে হবে এ দায় আমাদের।

অর্থমন্ত্রী এবার তার বাজেট বক্তৃতাতেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের অবদান সম্পর্কে বলেছেন। দুনিয়া জুড়ে মনে করা হয়, দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার যদি শতকরা ১০ ভাগ হয় তবে প্রবৃদ্ধি বাড়ে শতকরা ২ ভাগ। উন্নত দেশগুলোতে এটি ১ ভাগের বেশি হলেও আমাদের মতো দেশে এ হার ২ ভাগকে কখনও ছাড়িয়ে যায়। ফলে থ্রিজির আগমনে যতই বিলম্ব হলো আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ততই বেশি হলো। চলতি অর্থবছরের প্রত্যাশিত শতকরা ৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি আমরা হয়তো থ্রিজির কল্যাণেই পেতাম। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা ও অন্যদের কর্মকাণ্ডের ছক এক মাপে চলমান নয়। বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়ে আমাদের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষ পুরো জাতিকেই ঠেকিয়ে দিয়েছে। এটি একদিকে যেমন করে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, অন্যদিকে তেমনি পুরো জাতির লক্ষ্য ও গন্তব্যে পৌঁছার পথে অন্তরায়।

যেভাবেই হোক আমরা স্বপ্ন দেখি এবং সেজন্যই আমরা মনে করি আমাদের দেশে থ্রিজি প্রচলনের স্বপ্নও পূরণ হলো। কিন্তু এ স্বপ্নটির সুফল যাতে পুরো জাতি পেতে পারে তার জন্য আরও কিছু প্রাসঙ্গিক করণীয় রয়েছে, যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হতে পারে। আমার বিশ্বাস, যদি প্রসঙ্গটি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা না করা হয় এবং এর সঙ্কট ও সম্ভাবনা নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা না করা হয়, তবে থ্রিজির বিষয়টি খেই হারিয়ে ফেলতে পারে।

প্রায় এক বছর আগে থ্রিজি চালু হলেও শব্দটি এখন অতিপ্রচলিত হয়ে উঠেছে সেপ্টেম্বরের নিলাম আর অক্টোবরে চালু হওয়ার খবরে। তবে বিষয়টি নিয়ে তেমন স্পষ্ট ধারণা বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। আসুন, আমরা আলোচনা করি থ্রিজির প্রয়োজনীয়তা কী তা নিয়ে? আমি সংক্ষেপে অতিপ্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি। শুরুতেই আলোচনা করা যেতে পারে থ্রিজির সরাসরি সুফল কী পাওয়া যাবে, সেটি নিয়ে।

ক. **ভয়েস কলের পরিপক্কতা :** থ্রিজির প্রাথমিক যে সুফল মোবাইল ব্যবহারকারীরা পাবেন, তা হলো বিদ্যমান মোবাইল প্রযুক্তির উন্নয়ন। আমরা এখন যে ২.৫ জির মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, থ্রিজি তারচেয়ে উন্নত মানের ভয়েস কল দেবে। কল ড্রপ কমবে ও নেটওয়ার্কের শক্তিও বাড়বে। কথা অনেক স্পষ্ট হবে। থ্রিজির বাড়তি সুবিধা হলো এটি বিদ্যমান টুজি ও ২.৫ জির সাথে কম্প্যাটিবল। ফলে আমরা নতুন প্রযুক্তি নেব বলে পুরনোটা ফেলে দিতে হবে না।

খ. **ভিডিও কল :** থ্রিজির ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি বলে এর সহায়তায় ভিডিও কল করা যাবে। এর ফলে বস্তুত ভিডিও কনফারেন্স ছাড়াও ভিডিও সারভাইলেন্স, নিরাপত্তা এসব অনেক বিষয়ে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে।

গ. **মোবাইল টিভি :** থ্রিজি নেটওয়ার্কে মোবাইল ফোনে টিভি দেখার বিষয়টি যুক্ত হচ্ছে। ফলে যেকেউ যেখানে থ্রিজি নেটওয়ার্ক আছে সেখানে তার মোবাইল ফোনে টিভি দেখতে পাবেন। সবগুলো না হলেও বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেল এর মধ্যেই থ্রিজিতে তাদের সম্প্রচার অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। আমি ২০১২ সালের ৬ ডিসেম্বরের ▸

পত্রিকায় টেলিটকের বিজ্ঞাপন দেখেছি, তারা ওয়াপ পোর্টাল তৈরি করে তা দিয়ে বিনামূল্যে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের চতুর্থ ওয়ানডে খেলা দেখার ব্যবস্থা করেছে।

ঘ. **দ্রুতগতির ইন্টারনেট :** থ্রিজির সবচেয়ে বড় সুযোগটি হলো ইন্টারনেট বিষয়ক। এ নেটওয়ার্ক যেমন মোবাইল ইন্টারনেটে ব্যবহার করা যায়, তেমনি এর মডেম দিয়ে কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে প্রায় পৌনে চার কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সাড়ে তিন কোটি মানুষ মোবাইলের সহায়তায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। এদের সবচেয়ে বড় সমস্যার নাম স্পিড। বস্তুত জিএসএম নেটওয়ার্ক দিয়ে কোনোমতে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অডিও ভিজ্যুয়াল ডাটা বা গ্রাফিক্স আপলোড-ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান জিএসএম নেটওয়ার্ক মোটেই কার্যকর নয়। থ্রিজি দ্রুতগতির ইন্টারনেট দিতে পারবে বলে ব্যবহারকারীরা একে তার মতো করে ব্যবহার করতে পারেন।

বস্তুতপক্ষে কথা বলার জন্য বাংলাদেশের মতো একটি দেশে থ্রিজি না এলেও চলে। আমরা কথা বলার যে সাধারণ কাজ সেটি খুব সহজেই টুজি দিয়ে করতে পারছি। আমাদের ছোটখাটো ইন্টারনেটের কাজও আমরা টুজি দিয়ে করতে পারছি। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে দ্রুতগতির ইন্টারনেটনির্ভর কোনো কাজই করা যায় না। আমরা চাইছি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরাও আউটসোর্সিং করুক। সেই আশা পূরণ করতে হলে সেখানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট লাগবে। ওয়াইম্যাক্স অনেক আগে চালু হলেও তারা এমনকি জেলা শহরেও দ্রুতগতির ইন্টারনেট দিতে পারছে না। দেশের ৬৪টির মধ্যে ৯টির বেশি জেলায় ওয়াইম্যাক্স পৌঁছেনি। ওয়াইম্যাক্স নিয়ে আরও সমস্যা হলো এটি কোথাও কাজ করে, আবার কোথাও করে না। ফলে আমরা যদি অতিদ্রুত সারাদেশে থ্রিজি পৌঁছাতে পারি তবে ক্ষমতাবান করা হবে সেসব হতভাগাদের, যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। টুজির সহায়তায় আমরা সেই মানুষদের হাতে টেলিফোন দিতে পেরেছি, যারা তারের টেলিফোন হয়তো শত বছরেও পেত না। তেমনি করে থ্রিজির মাধ্যমে তাদের হাতে আমরা ইন্টারনেট দিতে পারছি, যারা তারের বা ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেট হয়তো সামনের ১০ বছরেও পেত না।

থ্রিজির ইন্টারনেট আরও একটি বাড়তি সুবিধা দেবে। এর ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওয়েবকাস্ট, রেডিও ইত্যাদি সম্প্রচার করা যাবে। ফলে আমরা ইন্টারনেট টিভি বা ইন্টারনেট রেডিওর যুগেও পা রাখব।

সার্বিকভাবে এ কথাটি খুব সহজেই বলা যায়, প্রচলিত মোবাইল যুগ থেকে থ্রিজি আমাদেরকে তথ্য মহাসরণীর একটি প্রশস্ত সড়কে স্থাপন করেছে। এ প্রশস্ত সড়কটি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেই অতিগুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিকতা, প্রশাসন, শিল্পসহ এমন কোনো খাত পাওয়া যাবে না, যাতে এ প্রযুক্তির প্রভাব পড়বে না।

তবে একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়াতে এখন থ্রিজির যুগ সমাপ্তির পথে। ফোরজি নিয়ে সারা দুনিয়াই আশাবাদী। আমরাও এ পরিবর্তনকে অবজ্ঞা করতে পারি না। বরং যদিও টেলিটক তার যাত্রা এ প্রযুক্তি দিয়ে শুরু করেছে, তথাপি অন্য অপারেটরেরা হয়তো থ্রিজির বদলে ফোরজি নিয়ে ভাবতে পারে। আমি মনে করি সেটি খুবই সঙ্গত একটি চিন্তাভাবনা হতে পারে। হাতের কাছে নতুন প্রযুক্তি থাকলে পুরনো প্রযুক্তি নিয়ে সামনে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

কেউ কেউ এ প্রশ্ন করে থাকেন, আমরা কেনো সরাসরি ফোরজিতেই চলে যাই না। বস্তুতপক্ষে আমাদের সরাসরি ফোরজিতে যাওয়ার সমস্যা হলো সেটি টুজি কম্প্যাটিবল নয়। ফোরজি নেটওয়ার্ক থ্রিজি কম্প্যাটিবল হলেও টুজি কম্প্যাটিবল না হওয়ার ফলে ফোরজি শুরুতে একেবারেই সীমিত হয়ে যাবে। আমাদের কোটি কোটি টুজি গ্রাহক ফোরজিতে

উত্তরণ ঘটাতে পারবে না। প্রযুক্তিগত বিষয় ও বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আমাদেরকে সম্ভবত আগে থ্রিজির প্রসার ঘটাতে হবে এবং তারপর ফোরজির দিকে যেতে হবে।

এটি একটি ভালো দিক, সরকার তরঙ্গ বরাদ্দ করার সময় এটি বলেনি যে থ্রিজি বা ফোরজি কোনটি বাছাই করা যাবে। বস্তুত যারা ৮ সেপ্টেম্বর লাইসেন্সের জন্য নিলাম করেছে তারা ইচ্ছে করলেই থ্রিজি বা ফোরজির যেকোনোটিই চালু করতে পারবে। অনেকেই এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন তারা ৩.৫ জি সিস্টেম চালু করবেন। কেউ কেউ ফোরজিও চালু করতে পারেন। এতে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা থাকছি না।

তবে থ্রিজি প্রচলন করাটাই বোধহয় শেষ কথা নয়। আমরা লক্ষ করছি, ২০০৬ সালে সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার পর থেকে দুই বছরে মাত্র ১২ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হয়েছিল। এর প্রধানতম কারণ ছিল, সাবমেরিন ক্যাবল আসার সাথে সাথে এর সাথে যুক্ত প্রাসঙ্গিক কাজগুলো করা হয়নি। এবারও যখন থ্রিজির লাইসেন্স দেয়া হলো তখন এর সাথে যুক্ত আরও কিছু কাজ করতে হবে।

প্রথমেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি নজর দিতে চাই। বিষয়টি কনটেন্ট। এ বিষয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকদেরকে সতর্ক হওয়ার অনুরোধ করছি। থ্রিজির প্রসারের অন্যতম একটি বাধা হলো কনটেন্ট। বাংলাদেশের টুজি মোবাইল গ্রাহকেরা নিজেরা কথা বলতে পারে বলে কনটেন্ট নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। এতে রিং টোন ডাউনলোড করার ব্যবস্থা আর গানের রাজ্য তৈরি করেই অপারেটরেরা তাদের ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারছেন। কিন্তু থ্রিজির গ্রাহকেরা শুধু কথা বলাতেই তুষ্ট থাকবেন না। তাদের জন্য বাংলাভাষার কনটেন্ট দরকার, বাংলাদেশের কনটেন্ট দরকার। শুধু থ্রিজি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হলেই সেটির প্রতি মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে তেমনটি প্রমাণিত হয়নি। এখন পর্যন্ত থ্রিজির যে ব্যবহার তা শুধু ইন্টারনেটের মধ্যে সীমিত হয়ে আছে। টেলিটকের সিম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মডেমের সাথেই বিক্রি হয়। সাধারণ মোবাইলের সিমের চেয়ে মডেমের সাথে সিমের ব্যবহার অনেক বেশি জনপ্রিয়। এটি প্রমাণ করে, প্রচলিত টুজি ও ওয়াইম্যাক্সের ইন্টারনেটে অসন্তুষ্ট গ্রাহকেরা টেলিটকের থ্রিজি বেছে নিয়েছে। আমি এটিও মনে করি, অন্য যারাই থ্রিজি চালু করবে তাদের কাছেও প্রথমে ইন্টারনেটের চাহিদাই বেশি থাকবে। যারা বুদ্ধিমান অপারেটর তাদের দায়িত্ব হওয়া উচিত শহরের চেয়ে গ্রামে আগে থ্রিজি চালু করা। কারণ গ্রাম, উপজেলা বা জেলা শহরগুলোতে এখন ইন্টারনেটের গতির চাহিদা প্রবল। ওখানে থ্রিজি দিতে পারলে মানুষ দ্রুত থ্রিজি গ্রহণ করবে। ঢাকা বা চট্টগ্রামে যেহেতু বিকল্প আছে, সেহেতু থ্রিজির নতুন চাহিদা অনেক বেশি নাও হতে পারে। তবে বড় বিষয় হলো থ্রিজির উপাত্ত পাওয়া। এখনই আমাদের বাংলা ও বাংলাদেশী কনটেন্ট পাওয়া উচিত।

খুবই দুঃখজনকভাবে এ কথাটি বলতে হচ্ছে, সরকারের কোনো পর্যায় থেকেই কনটেন্ট বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এমনকি কনটেন্ট বিষয়টি গুবলেট পাকিয়ে বসে আছে। বিটিআরসি ভ্যালু অ্যাডেড সেবা নামে একটি নীতিমালা তৈরি করে বেসরকারি ও তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটি কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। এ কনটেন্টের রাজ্যে এখন মোবাইল অপারেটরদের মনোপলি বিরাজ করে। ওরা খেয়ালখুশি মতো কনটেন্ট ডেভেলপারদের সাথে চুক্তি করে। এ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি নীতিমালা অত্যাবশ্যক ছিল। সেটি করা হয়নি।

অন্যদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি খাতে পর্যাপ্ত, প্রয়োজনীয়, বাংলা ও দেশী কনটেন্ট পাওয়া যায় না। এর প্রসার ঘটাতে না পারলে থ্রিজি যে কারণে এলো সে উদ্দেশ্যটি সফল হবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, দেশটি গরিব বলে প্রযুক্তিতে আমাদের পিছিয়ে থাকাটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং এটিই স্বাভাবিক, গরিব দেশের জন্য উন্নততর প্রযুক্তির বেশি প্রয়োজন কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com